

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রকাশনা

বর্ষ: ১৬, সংখ্যা: ২য়, এপ্রিল - জুন ২০২৬

সম্পাদক

জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

জাকির হোসেন

বাসন্তি সাহা

মোসাম্মৎ লাকী আক্তার

সুলতান মো: সালাউদ্দিন সিদ্দিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ফয়সাল এজাজ রিসান

আলোকচিত্র

নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক

সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি

লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ

ডি. এস. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৩৪/ ডি,

নিউ এলিফ্যান্ট রোড

ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

যোগাযোগ

ফোন: ৮৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স: ৮৮১২১৪৫৫

মোবাইল: ০১৭১৩১৩১৩৪৮,

০১৭১৩০৮১৮৫২

ই-মেইল: nupublication2012@gmail.com



রেইনবো বাংলাদেশের পথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, জ্ঞান ও ন্যায্য অংশীদারিত্ব

প্রতি বছরের ৯ আগস্ট ‘আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস’ আমাদের একটি মৌলিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আর সেটি হলো-একটি রাষ্ট্রের শক্তি তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, ন্যায্যভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং সকল জনগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার সক্ষমতায়। আজকের বিশ্বে উন্নয়নের মানদণ্ড শুধু মাথাপিছু আয়, অবকাঠামো কিংবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে সীমাবদ্ধ নেই; বরং একটি রাষ্ট্র কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক, কতটা বৈষম্যহীন এবং কতটা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান করে-তাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর প্রায় ৪৭৬ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানবসভ্যতার প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক-বাহক।

শান্তি ও ন্যায্যভিত্তিক উন্নয়নে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর একীভূতকরণ

দ্বন্দ্ব রূপান্তর হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান বিষয়গুলোর পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত কারণ, সম্পর্কের সংকট এবং কাঠামোগত বৈষম্য চিহ্নিত করে ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান যখন দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তরের নীতি অনুসরণ করে, তখন তা শুধু বিরোধ কমাতে সহায়তা করে না; বরং জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনগুলোর জন্য এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ও প্রয়োজনীয়।

যা আছে

নারী মধ্যস্থতাকারীদের ক্ষমতায়নের গল্প:	০৩
শান্তি ও ন্যায্যভিত্তিক উন্নয়নে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর একীভূতকরণ	১১
এলডিসি গ্রাজুয়েশন ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার	১৭
রেইনবো বাংলাদেশের পথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, জ্ঞান ও ন্যায্য অংশীদারিত্ব	২৩
নিজের গড়া ডব্লিউটিও নিজেই বদলাতে চায় আমেরিকা	২৭

সম্পাদকীয়

একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো আইন ও ন্যায়বিচারে সর্বসাধারণের সমান প্রবেশাধিকার। সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি, নারী ও শিশুদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। এর বিপরীতে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও ব্রাকের গবেষণায় দেখা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় মাত্র ৩ শতাংশের সাজা হয়। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল প্রমাণ, সাক্ষীর অনুপস্থিতি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

পারিবারিক নির্যাতন ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, চুক্তি ও আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের মতো বিষয়গুলোতে দরিদ্র মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (Restorative Justice) কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এই রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (Restorative Justice) বা পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার এমন একটি বিচার দর্শন ও প্রক্রিয়া, যা অপরাধের কারণে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্ক নিরাময়ের ওপর জোর দেয়। ফলে দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানি অনেকাংশে কমে যায়। প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ কমিয়ে এই পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কমিউনিটি প্যারালিগ্যালরা কাজ করছে। স্থানীয় জনমিতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের কাজ একটি টেকসই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।

এই সময়ে বাংলাদেশকে অনেকগুলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। জ্বালানি তেল, গ্যাসের সংকট, যুদ্ধ ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের টানা পোড়েন বাংলাদেশের মতো ছোট ছোট দেশগুলোর টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রতিবছর ২০-২২ লাখের বেশি তরুণ যুক্ত হচ্ছে। কেবল তৈরি পোষাক, প্রবাসী আয় আর কাঁচা চামড়া রপ্তানি দিয়ে এই বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এর উপর ২০২৯ সালে (প্রস্তাবিত) এলডিসি গ্রাজুয়েশন হলে রপ্তানিবাজার সংকুচিত হবে, বেকারত্ব বাড়বে, পাশাপাশি ওষুধের মতো জীবনরক্ষাকারী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি সেটা বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়বে।

জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে বাংলাদেশের চূড়ান্ত উত্তরণ (Graduation) পরবর্তী সময়ে শুষ্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা (DFQF) ভ্রাস পাবে এবং ওষুধশিল্পসহ বহুমাত্রিক খাতগুলোতে মেধা স্বত্ব সংক্রান্ত ছাড় শিথিল হবে। এই উত্তরণকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশকে বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখতে এবং ট্রিপস (TRIPS) চুক্তির নমনীয়তা পেতে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে দেশীয় শিল্প খাতের গুণগত মান ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

একটি বৈষম্যহীন, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস প্রতি বছর আমাদের মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়ন কখনোই কাউকে পেছনে ফেলে রেখে হতে পারে না। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার, নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা একটি বৈচিত্র্যময় ও প্রগতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরি করে।



নারী মধ্যস্থতাকারীদের ক্ষমতায়নের গল্প: কীভাবে RJMF-এর নারী সদস্যরা ন্যায়বিচারের নতুন কমিউনিটি অ্যাডভোকেট হয়ে উঠছেন

মোসা: লাকী আক্তার

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ চিরকালই নারীর জন্য কঠিন ছিল। প্রথাগত সালিশ ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সাধারণত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত থেকেছে, যেখানে নারীর কণ্ঠস্বর প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে অথবা প্রভাবশালীদের সিদ্ধান্তের নিচে চাপা পড়ে গেছে। পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ কিংবা নারীর ওপর সামাজিক নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে ন্যায় সমাধান পাওয়া নারীদের জন্য এখনও দুরূহ। ঠিক এই বাস্তবতা বদলে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নাগরিক উদ্যোগ (NU),

Brot für die Welt (BfdW)-এর আর্থিক সহায়তায়, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়ন করছে "Community-based Dispute Resolution Mechanisms and Improving Gender-just Access to Justice in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প। তিনটি জেলার ছয়টি উপজেলা জুড়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবিক এবং জেভার-ন্যায়ভিত্তিক বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার-বিশেষত নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার উন্নয়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস

ও কমিউনিটি মেডিয়েশনকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে এমন একটি সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে, যেখানে বিরোধের সমাধান হবে সংলাপ, পারস্পরিক সম্মান এবং কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। এই লেখায় আমরা তুলে ধরব কীভাবে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এন্ড মেডিয়েশন ফোরাম (RJMF)-এর মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা মধ্যস্থতাকারী, মানবাধিকার রক্ষাকারী ও কমিউনিটি নেতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং কীভাবে এই পরিবর্তন গোটা কমিউনিটির ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সংস্কৃতিকেই ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছে।

প্রথাগত সালিশ বনাম রেস্টোরেটিভ জাস্টিস ও কমিউনিটি মেডিয়েশন

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পারিবারিক, সামাজিক ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় বিরোধ সৃষ্টি হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্প্রীতি এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব বিরোধের একটি বড় অংশ আদালতের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে নারী, শিশু, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক সময় এই প্রক্রিয়া ন্যায়সংগত, অংশগ্রহণমূলক কিংবা মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে না। আদালতের বিচার প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হলেও সময়, ব্যয় ও জটিলতার কারণে অনেক মানুষ স্থানীয় সমাধানের পথ খোঁজেন। এমন বাস্তবতায় বিশ্বব্যাপী “রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (RJ)” এবং “কমিউনিটি মেডিয়েশন” একটি কার্যকর, মানবিক এবং অংশগ্রহণমূলক বিকল্প হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য শুধু বিরোধের নিষ্পত্তি নয় বরং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্ক পুনর্গঠন, পারস্পরিক বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে সংঘাত প্রতিরোধে সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিরোধ নিষ্পত্তির সবচেয়ে পরিচিত মাধ্যম সালিশ। তবে প্রথাগত সালিশের কিছু সীমাবদ্ধতা দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ্য করা গেছে:

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সীমিত বা অনুপস্থিত;
- প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতামতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া;
- ভুক্তভোগীর মানসিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের দিকটি প্রায়ই উপেক্ষিত থাকা;

- নারীর প্রতি সহিংসতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে সংবেদনশীলতার অভাব থাকে।

এর বিপরীতে, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (RJ) ও কমিউনিটি মেডিয়েশন পদ্ধতি একটি ভিন্ন দর্শনে প্রতিষ্ঠিত। এখানে মূল লক্ষ্য শুধু “কে দোষী?” তা নির্ধারণ করা নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্ক পুনর্গঠন, ভুক্তভোগীর কথা শোনা এবং সব পক্ষের সম্মতিতে একটি টেকসই সমাধানে পৌঁছানো। এই পদ্ধতি-

- আদালতের দীর্ঘসূত্রতা ও আর্থিক ব্যয় এড়িয়ে দ্রুত সমাধান দেয়;
- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে অগ্রাধিকার দেয়;
- সমাধান প্রক্রিয়ায় সম্মান, সহানুভূতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে কেন্দ্রে রাখে;
- কমিউনিটির নিজস্ব মালিকানা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

কেন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রয়োজন?

বাংলাদেশে আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া আইনগতভাবে নির্ভরযোগ্য হলেও বাস্তবে এটি অনেক সময় দীর্ঘ, ব্যয়বহুল এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আদালতে যাওয়া মানে শুধু অর্থব্যয় নয়, বরং সময়, যাতায়াত, আইনি জটিলতা এবং মানসিক চাপেরও বিষয়।

অন্যদিকে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সমাধান দিলেও সেখানে সবসময় সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয় না। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতামত অনেক সময় চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, ফলে নারী, দরিদ্র বা সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষ তাদের বক্তব্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পান না। অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণও সীমিত থাকে। ফলে এমন একটি বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভূত হয়, যেখানে-

- সকল পক্ষ সমানভাবে কথা বলার সুযোগ পাবে;
- মানবাধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে;
- নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে;
- সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা পাবে;
- ভবিষ্যতের সংঘাত কমে আসবে।

রেস্টোরেটিভ জাস্টিস ও কমিউনিটি মেডিয়েশন এই চাহিদাগুলোর একটি কার্যকর উত্তর হিসেবে কাজ করছে।

রেস্টোরেটিভ জাস্টিস: শান্তির পরিবর্তে সম্পর্ক পুনর্গঠনের দর্শন

রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এমন একটি বিচারদর্শন, যেখানে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয় মানুষের ক্ষতি কীভাবে পূরণ করা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্ক কীভাবে পুনর্গঠন করা যায় তার ওপর। এখানে কোনো পক্ষকে জয়ী বা পরাজিত ঘোষণা করার পরিবর্তে সমস্যার মূল কারণ বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করা হয় যা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা একত্রে বসে আলোচনা করেন। প্রত্যেকের বক্তব্য শোনা হয়, অনুভূতির মূল্য দেওয়া হয় এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে সমাধান খোঁজা হয়। রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রতিশোধ নয়, দায়বদ্ধতা ও পুনর্মিলনের ওপর গুরুত্ব দেয়। ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কও পুনরুদ্ধার হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয়, কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার এবং বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর সম্ভাবনা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, বিশেষ করে গ্রামীণ পর্যায়ে মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে।

RJMF: প্রশিক্ষণ থেকে নেতৃত্বে উত্তরণ

প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম হলো রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এন্ড মেডিয়েশন ফোরাম (RJMF)। এই ফোরামের মাধ্যমে নাগরিক উদ্যোগের কমিউনিটি সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের কর্মীরা-এবং একই লক্ষ্যে কাজ করা অন্যান্য সংস্থা ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাও-একত্রিত হয়ে সালিশ ও RJ মডেল সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং প্রয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অধিকার, মানবাধিকার, আইনি অধিকার, পারিবারিক আইন, জেন্ডার, দ্বন্দ্ব নিরসন, RJ ও সালিশ পদ্ধতি এবং নেতৃত্ব বিষয়ক নানা দিক-যা মূলত অনানুষ্ঠানিক ন্যায়বিচার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়। এই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানেও স্পষ্ট। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১,৩৫০ জন (নারী ৬৪৮ জন, পুরুষ ৭০২ জন) এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং তারা বর্তমানে প্রশিক্ষিত সালিসদার বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কমিউনিটিতে বিরোধ মীমাংসার কাজ করছেন। ২০২২ থেকে ২০২৫-এই তিন বছরে মোট ৩,৮০৯টি নিবন্ধিত অভিযোগের মধ্যে ৩,০৮০টি অভিযোগ রেস্টোরেটিভ জাস্টিস (RJ) ও কমিউনিটি মেডিয়েশন পদ্ধতির মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়েছে। এই মীমাংসা প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মোট সালিশদারের ৪৮% নারী মধ্যস্থতাকারী-যারা কেবল উপস্থিত থাকেননি, বরং সক্রিয়ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন, সালিশ সভাপতিত্ব করেছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়েছেন এবং প্রতিটি ধাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রায় অর্ধেক মধ্যস্থতাকারী পদে নারীর এই উপস্থিতি প্রমাণ করে যে RJMF শুধু একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নয়-এটি নারীর নেতৃত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার একটি বাস্তব প্ল্যাটফর্মে পরিণত হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নারীদের অংশগ্রহণে।

ফলাফল হিসেবে দেখা গেছে:

- **আইনি সাক্ষরতা বৃদ্ধি:** নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং অন্যদেরও সচেতন করছেন।
- **মধ্যস্থতার দক্ষতা অর্জন:** সক্রিয় শ্রোতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, এবং উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার কৌশল রপ্ত করা।
- **আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক স্বীকৃতি:** যে নারী একসময় নিজের পারিবারিক বিষয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগ পেতেন না, তিনিই আজ কমিউনিটির জটিল বিরোধ মেটানোর দায়িত্ব পালন করছেন।
- **নেতৃত্বের বিস্তৃতি:** মধ্যস্থতার বাইরেও তারা মানবাধিকার রক্ষাকারী ও কমিউনিটি অ্যাডভোকেট হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখছেন।

নারীদের সচেতন করেন এবং কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেন। যেখানে নাগরিক উদ্যোগ-এর কমিউনিটি প্যারালিগালরা সব সময় সহায়তা করে থাকেন।

গ্রামীণ সমাজ গড়ায় RJMF-দলের নারী মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা

RJMF-এর নারী মধ্যস্থতাকারীরা গ্রামীণ সমাজে ন্যায়বিচারের নতুন দিশারি হয়ে উঠেছেন। তারা সালিশ ও বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা ও সামাজিক বিবাদ নিরসন করে নিজেদের কমিউনিটির সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাদের এই ক্ষমতায়নের গল্প তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য উদাহরণ। বিশেষ করে RJMF-এর নারী সদস্যরা নিজেদের সমাজেই ন্যায়বিচারের নতুন কমিউনিটি অ্যাডভোকেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।



কীভাবে তারা কাজ করেন

RJMF-এর নারী সদস্যরা শুরুতেই আইনি অধিকার, মানবাধিকার এবং মধ্যস্থতা বা সালিশ করার নিয়মনবানুনের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা জটিল পরিস্থিতি শান্তভাবে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন করেন। এরপর তারা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে

বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনন্য সাফল্য

RJMF-এর নারী মধ্যস্থতাকারীরা সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার বজায় রাখতে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করছেন। পারিবারিক কলহ, সম্পত্তি বণ্টন, বিবাহবিচ্ছেদজনিত সমস্যা এবং ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদের মতো বিষয় তারা খুব দক্ষতার সঙ্গে সমাধান করেন।

অনেক সময় পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন, তখন এই নারী মধ্যস্থতাকারীরা এগিয়ে আসেন। তারা উভয় পক্ষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং আইন ও সামাজিক রীতিনীতির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন।

সহমর্মিতা ও আস্থার প্রতীক

গ্রামের নারীরা সাধারণত পুরুষ সালিসকারীদের সামনে নিজের পারিবারিক সমস্যার কথা বলতে লজ্জা বা ভয় পেতেন। RJMF-এর নারী মধ্যস্থতাকারীরা সেই বাধা দূর করেছেন। ভুক্তভোগী নারীরা তাদের কাছে খুব সহজে নিজেদের সমস্যা ও কষ্টের কথা প্রকাশ করতে পারেন। এই মধ্যস্থতাকারীরা সমস্যাটি সহমর্মিতার সঙ্গে উপলব্ধি করেন এবং সমাধানের পথ দেখান। ফলে তারা গ্রামীণ নারীদের জন্য একাধারে ভরসার জায়গা ও আইনি সহায়তার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

আইনি জ্ঞান থেকে সামাজিক নেতৃত্ব

আইনি অধিকার, জেডার-জাস্ট জাস্টিস ও অনানুষ্ঠানিক ন্যায়বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর এই নারীরা শুধু মধ্যস্থতার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকছেন না। তারা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিটিতে নারীর অধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরিতেও ভূমিকা রাখছেন। ফলে আনুষ্ঠানিক আদালতে মামলা দায়েরের প্রবণতা কমে আসছে, আর বাড়ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থানীয় সমাধান পদ্ধতির প্রতি আস্থা।

সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন

এই নারী মধ্যস্থতাকারীদের কাজের ফলে গ্রামীণ সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন আসছে। তারা প্রমাণ করেছেন যে নারীরা শুধু ঘরের কাজেই সীমাবদ্ধ নন; তারা চাইলে সমাজের বড় বড় বিবাদ মিটিয়ে শান্তি বজায় রাখতেও সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে তারা বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।



মাঠ অভিজ্ঞতা ১: একজন নারী মধ্যস্থতাকারীর যাত্রা

নাম: মনজুয়ারা বেগম (৪৪); পিতা: মৃত মোজাহার আলী; মাতা: মোসা. আরফা বেগম। পিতা পেশায় একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। মনজুয়ারার শৈশব কেটেছে রংপুর জেলার বিন্দিবাড়ী (রাধাকৃষ্ণপুর), রাজেশপুরে। তারা ৭ ভাই ৩ বোন। তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ১৫ বছর বয়সে সম্পর্কের মাধ্যমে ২৫ বছর বয়সী মো. ফুলু মিয়াকে বিয়ে করেন। স্বামী ফুলু মিয়া পেশায় একজন গাড়িচালক।

বিয়ের পর তিনি স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও পরিবারের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যৌথ পরিবারে থাকতেন। কিন্তু সম্পর্ক করে বিয়ে করার কারণে স্বামীর পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে খারাপ আচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। ১ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী মনজুয়ারা। মেয়েকে এমএ পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন; একমাত্র ছেলে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। ২০০৪ সালে নাগরিক উদ্যোগ যখন “ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার ও সালিশি ব্যবস্থা” প্রকল্পের আওতায় রংপুর সদর এলাকায় কাজ শুরু করে, তখন প্রাক্তন কমিউনিটি মোবাইলাইজার মো. সাজু মিয়ার মাধ্যমে নাগরিক উদ্যোগ এর অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা নাগরিক অধিকার দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। নাগরিক অধিকার দলে যুক্ত

হয়ে তিনি মানবাধিকার, নারী অধিকার, সালিশি, নেতৃত্ব, জেডার, নারী মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক উদ্যোগ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি নাগরিক অধিকার দল থেকে তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কে যোগ দেন। সংগঠনে যুক্ত হওয়ার পর বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, পাড়া প্রতিবেশি ও সমাজ থেকে তাকে বিভিন্ন রকম বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। এলাকায় মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে তিনি শুনেছেন নানা রকম অপমানসূচক মন্তব্য। তবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ফোরামে কথা বলার দক্ষতা এবং নিজের সন্তানদের লেখাপড়া করানোর মাধ্যমে তিনি নিজেকে আস্থার জায়গায় নিয়ে গেছেন।

২০২২ সালে তিনি RJMF দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আবারও নাগরিক উদ্যোগ থেকে প্রশিক্ষণ নেন। সেই থেকে তিনি তার এলাকার কমিউনিটির মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। কখনো সালিশি পরিচালনা করেন, কখনো RJ সেশন পরিচালনা করেন। পাশাপাশি সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন সুবিধা (মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্ড, দুর্বল নারী সহায়তা কার্ড, বিধবা ভাতা কার্ড, প্রতিবন্ধী ভাতা, টিউবওয়েল এবং টিসিবি কার্ড) পেতে মানুষকে সহায়তা করেন। স্বামীর অসুস্থতা তাকে হতাশা ও কষ্ট দিয়েছে, তবু তিনি থেমে থাকেননি নিরন্তর

ছুটে চলেছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমস্যা সমাধানে। সামাজিক কাজের কারণে যে পরিবারের সদস্যরা একসময় তাকে অপছন্দ করতেন ও বাধা দিতেন, তারাই আজ তার জনহিতকর কাজের প্রশংসা ও মূল্যায়ন করেন, যা তাকে কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন, আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে তার স্বামী, নাগরিক উদ্যোগ এবং নাগরিক অধিকার দল রংপুর মহানগরের সভাপতি খন্দকার আরব আলী বাবুলের সহযোগিতা সবসময় ছিল। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবনে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর মা হিসেবে স্কুল থেকেও তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নারীর সার্বিক উন্নয়নে অধিকার বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি আর্থিক স্বাবলম্বিতার ওপর জোর দেওয়া জরুরি বলে তিনি মনে করেন। নারী ও সমাজের উন্নয়নে তার স্বপ্ন-জনপ্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের অনগ্রসর মানুষের জন্য কাজ করা। বর্তমানে তিনি তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের রংপুর সদর ও মহানগরের সভাপতি এবং স্থানীয় স্কুল কমিটির সদস্য।



(মেনজুরা বেগম)

মাঠ অভিজ্ঞতা ২: গৃহবধু থেকে জনপ্রতিনিধি

"আমরা নারী, আমরাও পারি" - এই প্রতিজ্ঞায় বলীয়ান হয়ে হিরণ বেগম আজ গৃহবধু থেকে জনপ্রতিনিধি।

বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নে হিরণ বেগম জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে, তার নিজের মতামত না নিয়েই, চরবাড়িয়া ইউনিয়নের নরকাঠি গ্রামের ২৫ বছর বয়সী মো: জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে যৌথ পরিবারে থাকতেন। জাহাঙ্গীর হোসেন পেশায় কৃষিজীবী। হিরণ বেগম ও জাহাঙ্গীর হোসেনের সংসারে ৩ ছেলে। প্রথম সন্তান ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় সন্তান চাকরিজীবী এবং তৃতীয় সন্তান এইচএসসিতে অধ্যয়নরত। তিনি বেসরকারি মানবাধিকার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান নাগরিক উদ্যোগ এর অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা নাগরিক অধিকার দলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রকল্পের কার্যক্রমের শুরু থেকেই যুক্ত আছেন। এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার ও সচেতনতা উন্নয়নে কাজ করার অভিপ্রায় থেকেই তিনি RJMF দলে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নাগরিক উদ্যোগ থেকে তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মানবাধিকার, নারী অধিকার, সালিশ, নেতৃত্ব, জেভার, নারী মর্যাদা, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ নানা বিষয়ে। স্থানীয় পর্যায়ে সালিশযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি প্রতিটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং স্থানীয় অন্য নারীদেরও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেন। এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডে (১, ২ ও ৩ নং) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি মনে করেন, দীর্ঘদিন ধরে অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করার এই ইতিবাচক প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপই মানুষ তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। সম্প্রতি তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাগরিক অধিকার দলের উপজেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন সরকারি

প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া সহযোগিতা তিনি নিজ উদ্যোগে এলাকার অসহায় মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় নরকাঠি গ্রামে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে এতিম শিশুদের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলার পথে সাফল্যের পাশাপাশি কষ্টকর অভিজ্ঞতাও কম হয়নি। তিনি জানান, ২০২১ সালে স্থানীয় একটি বিরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে সেখানকার কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির হাতে তাকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি হতচকিত হয়ে পড়েন, পরে স্থানীয় চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। ন্যায়ের পথে লড়াই করতে গিয়ে এমন বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তাকে সাময়িকভাবে হতাশ করলেও, একই সঙ্গে তা তাকে ন্যায়ের পথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।



(হিরণ বেগম)

হিরণ বেগমের বক্তব্য

"RJMF দলের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলাকার বাইরেও বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও স্থানীয় সালিশে অংশগ্রহণ করি। নাগরিক উদ্যোগ আমাকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে আমার পরিচিত এলাকার বাইরেও আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে পেরে আমি গভীরভাবে উৎসাহিত বোধ করি। আজ আমার এই অবস্থানে

আসার পেছনে নাগরিক উদ্যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য, আর এ জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। একজন নারী হিসেবে আমি মনে করি, সংসারই নারীর একমাত্র জায়গা নয়-ইচ্ছা থাকলে সংসার সামলেও একজন নারী অনেক দূর যেতে পারে। দীর্ঘদিন মানুষের জন্য কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবেই আমি স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, সমাজ উন্নয়নে নারীদেরও কাজ করার সুযোগ আছে-সেজন্য দৃঢ় মনোবল ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বাধা আসবে, তবু লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, আমরা নারী, আমরাও পারি।"

মাঠ কেস স্টাডি: একটি বিরোধ যেভাবে সমাধান হলো

ঘটনাস্থল: টুঙ্গিবাড়ীয়া ইউনিয়ন, বরিশাল সদর উপজেলা, বরিশাল।

অভিযোগ নং-৩৩

টুঙ্গিবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবের হাট গ্রামের দরিদ্র কৃষক ফয়েজ উদ্দিনের মেয়ে নুরজাহান বেগমের সাথে একই গ্রামের জব্বার শিকদারের বিয়ে হয়েছিল ১৭ বছর আগে। জব্বার বরিশালে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন এবং তাদের সংসারে তিনটি সন্তান ছিল। কিন্তু আট মাস আগে জব্বার বরিশালের চাকরি ছেড়ে ঢাকায় নতুন কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে-তিনি ধীরে ধীরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেন, নিয়মিত ভরণপোষণ দেওয়া বন্ধ করে দেন, এমনকি স্ত্রীর মাধ্যমে নেওয়া ব্র্যাকের ঋণের কিস্তিও পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকেন। পরে নুরজাহান জানতে পারেন, তার অজান্তেই ও অনুমতি ছাড়াই জব্বার ঢাকায় দ্বিতীয় বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেছেন।

একা ও অসহায় হয়ে পড়া নুরজাহানের পাশে এসে দাঁড়ান টুঙ্গিবাড়ীয়া ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এবং নাগরিক উদ্যোগের RJMF দলের সদস্য হীরন বেগম। তার সরাসরি সহায়তায় নুরজাহান স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও ভরণপোষণ

না পাওয়ার অভিযোগে নাগরিক উদ্যোগে অভিযোগ দায়ের করেন।

মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া

অভিযোগ পাওয়ার পর কমিউনিটি প্যারালিগাল মাকসুদা বেগম ও হীরন বেগম যৌথভাবে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন এবং জব্বার শিকদারের সাথে যোগাযোগ করে তাকে সালিসে বসতে রাজি করান। ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সালিশে উভয় পক্ষ উপস্থিত হন, এবং দুই পক্ষের সম্মতিতেই সভাপতিত্ব করেন হীরন বেগম নিজে-যা প্রমাণ করে কমিউনিটিতে একজন নারী মধ্যস্থতাকারীর প্রতি কতটা আস্থা তৈরি হয়েছে।

উভয় পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনার পর সালিসদারগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তা ছিল স্পষ্টভাবে ন্যায়সঙ্গত ও নারী-স্বার্থ সুরক্ষামূলক:

- জব্বার প্রথম স্ত্রী নুরজাহানের অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে আইনগত অপরাধ করেছেন বলে স্বীকৃত হয়;
- জব্বারকে উভয় স্ত্রীকে সমান মর্যাদা দিতে এবং নিয়মিত ভরণপোষণ দিতে বাধ্য করা হয়;
- নুরজাহান তার সন্তানদের সহ শ্বশুরবাড়িতে সম্মানের সাথে থাকার অধিকার পান, এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে তার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়;
- জব্বারকে বকেয়া ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ এবং প্রতি মাসে অন্তত একবার বরিশালে ফিরে পরিবারের প্রতি যত্নশীল থাকার শর্ত দেওয়া হয়।

জব্বার শিকদার তার আচরণের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং সালিসের সিদ্ধান্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেন।

নুরজাহানের ভাষায়

সালিশ শেষে নুরজাহান বেগম বলেন-

"আমার স্বামীর আচরণে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, কী করব সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন বিপদের বন্ধু হিসেবে হীরন বেগম আমার পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা করেন। তার পরামর্শে আমি নাগরিক উদ্যোগে অভিযোগ দায়ের করি। সালিসে আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি। আশা করি আমার স্বামী সালিসের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।"



(নুরজাহান বেগম)

কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন

নারী মধ্যস্থতাকারীদের এই উত্থান শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি গোটা কমিউনিটির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে। যখন একজন নারী মধ্যস্থতাকারী দুই বিবাদমান পক্ষকে সম্মানের সঙ্গে শুনে ন্যায় সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করেন, তখন তা কমিউনিটিতে নারীর নেতৃত্ব সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি করে। যে সমাজ একসময় নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিত না, সেই সমাজই আজ ধীরে ধীরে নারীর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে এবং সম্মান জানাচ্ছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো আনুষ্ঠানিক আদালতে মামলা দায়েরের প্রবণতা হ্রাস পাওয়া। কমিউনিটির মানুষ এখন স্থানীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কম ব্যয়সাপেক্ষ সমাধান পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। এতে একদিকে যেমন আদালতের ওপর চাপ কমছে, তেমনি কমিউনিটির সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় হচ্ছে।



নেতৃত্বের স্বীকৃতি: জয়িতা পুরস্কার থেকে স্থানীয় নির্বাচন পর্যন্ত

বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমে সক্রিয় সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে নারীরা কেবল কমিউনিটির মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই নয়, বরং সমাজ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একজন দৃশ্যমান নেতা হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সম্পৃক্ততা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি কমিউনিটিতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্বের পরিসরকেও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করেছে।

এর একটি বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় স্বীকৃতি ও নির্বাচনী সাফল্যের পরিসংখ্যানে। সম্প্রদায় উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এখন পর্যন্ত ৪৫ জন নারী 'জয়িতা পুরস্কার' অর্জন করেছেন। যা প্রমাণ করে তাদের সামাজিক অবদান শুধু স্থানীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পর্যায়েও পৌঁছেছে।



এছাড়াও, প্রকল্প এলাকার ১৭২ জন (নারী-১০৭ পুরুষ-৬৫) সাহস নিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, এবং আনন্দের বিষয় হলো তাদের মধ্যে ৪৮জন নারী এবং ১২জন পুরুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারীদের মধ্যে বিজয়ের এই হার নিছক সংখ্যা নয়-এটি কমিউনিটির আস্থার একটি স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ভোটাররা নারীর নেতৃত্বকে যোগ্য বিবেচনা করে ভোট দিয়েছেন।

এই ফলাফলগুলো একসাথে একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়: RJMF- দলের মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মধ্যস্থতার দক্ষতা নারীদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বগুণ তৈরি করেছে, তা কমিউনিটি পর্যায়ে ছাড়িয়ে আজ প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক পরিসরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একজন নারী যিনি একদিন প্রতিবেশীর পারিবারিক বিরোধ মেটাতে সহায়তা করেছিলেন, আজ তিনিই হয়তো ইউনিয়ন পরিষদে বসে পুরো এলাকার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সমাজের অংশীদারিত্ব

প্রকল্পের সাফল্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, স্থানীয়

নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজের কর্মীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে RJ ও মেডিয়েশন পদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে RJMF-কে সহযোগিতা করছেন। এই বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরও টেকসই ও গ্রহণযোগ্য করে তুলছে।

প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় বিশেষজ্ঞের প্রতিক্রিয়া

এই আস্থা ও সহযোগিতার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গত ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে গুল্লাল বুদাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি প্রকল্প অবহিতকরণ সভায়। রংপুর মহানগরীর ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের পুলিশ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মো: রেজাউল করিম নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রম দেখে নিজের অনুপ্রেরণার কথা তুলে ধরে বলেন-

“নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রম দেখে আমি সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই সংস্থা প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে বিরোধ মীমাংসা করছে, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবারে যদি সঠিক বিচার দিয়ে সংসার পরিচালনা করি, তাহলে গোটা সমাজও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। নাগরিক উদ্যোগ মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করছে এবং মন্দ পথ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করছে-তাই এই কার্যক্রমের প্রসার ও প্রচার আরও বেশি জরুরি।”

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নাগরিক উদ্যোগের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে দেশে প্রায় নব্বই হাজার মানুষের জন্য একজন বিচারক রয়েছেন-এই বাস্তবতায় প্রতিটি পরিবার ও কমিউনিটি যদি নিজেরাই ন্যায্য সমাধানের চর্চা করে, তবে তা গোটা বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে। তিনি জমি-জমা সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে সালিশ পরিচালনার পরামর্শ দেন এবং সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে নাগরিক উদ্যোগের এই একক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তিনি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে থেকেই নাগরিক উদ্যোগকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনে থানার সহায়তা নেওয়ার প্রস্তাব দেন। এমনকি তার বক্তব্য শোনার পর সভায় উপস্থিত তার সহকর্মী তিনজন কনস্টেবলও নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান প্রকাশ করেন-যা প্রমাণ করে প্রকল্পের এই মানবিক উদ্যোগ কীভাবে বিভিন্ন পেশা ও অবস্থানের মানুষকে একই লক্ষ্যে সম্পৃক্ত করতে পারছে।

চ্যালেঞ্জ ও শেখার অভিজ্ঞতা

যেকোনো সামাজিক পরিবর্তনের মতোই এই যাত্রাও চ্যালেঞ্জমুক্ত নয়। নারী মধ্যস্থতাকারীদের প্রাথমিক পর্যায়ে পারিবারিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কেউ কেউ পরিবার থেকে অনুমতি পেতে সংগ্রাম করেছেন, কেউ কমিউনিটির পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন। তবে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সংবেদনশীলতা কার্যক্রম ও সফল মধ্যস্থতার দৃষ্টান্তগুলো ধীরে ধীরে এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে।

সামনের পথ: RJ ও মেডিয়েশন সেন্টারের মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ

এই প্রকল্পের একটি বড় অর্জন হলো নারীদের মধ্যস্থতাকারী, মানবাধিকার রক্ষাকারী ও কমিউনিটি নেত্রী হিসেবে সক্ষম করে তোলা। নারীর সক্রিয় উপস্থিতি বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলছে। প্রকল্পের এই অর্জনগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি রূপ দিতে নাগরিক উদ্যোগ এখন উদ্যোগী হয়েছে RJ ও মেডিয়েশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায়। লক্ষ্য একটাই - নাগরিক উদ্যোগের সরাসরি সম্পৃক্ততার বাইরেও যেন কমিউনিটি নিজেই এই ন্যায়বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। এই কেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে-

- নতুন নারী মধ্যস্থতাকারী তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হয়ে উঠবে;



- স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি স্থায়ী কাঠামো হয়ে গড়ে উঠবে;
- কমিউনিটির নিজস্ব মালিকানা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে;
- পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে;
- ভবিষ্যতে নাগরিক উদ্যোগের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা কমলেও স্থানীয় মানুষ নিজেরাই এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারবেন।

ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা

RJMF-এর নারী মধ্যস্থতাকারীদের ক্ষমতায়নের এই গল্প দেখায় যে, নারীদের হাতে ক্ষমতা ও সঠিক প্রশিক্ষণ তুলে দিলে তারা পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারেন। তারা শুধু বিরোধ মেটান না, বরং সমাজে একটি ন্যায়পরায়ণ ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করেন। তাদের এই নীরব ও সাহসী অবদান আমাদের সমাজে ন্যায়বিচারের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যা অন্যান্য এলাকার নারীদের জন্যও এক বড় অনুপ্রেরণা।

উপসংহার

সামাজিক মধ্যস্থতায় পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য, কে সঠিক বা কে ভুল তা নির্ধারণ করা নয়। বরং এটি প্রশ্ন করে: কী ভুল হয়েছিল, মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এবং পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য আমরা কী করতে পারি? এটি এমন একটি পথ, যা মর্যাদাকে সম্মান করে, সংযোগকে উৎসাহিত করে এবং আরও শক্তিশালী ও সহানুভূতিশীল সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

নাগরিক উদ্যোগ ও Brot für die Welt (BfdW) এর এই যৌথ উদ্যোগ শুধু বিরোধ নিষ্পত্তির একটি বিকল্প পদ্ধতি তৈরি করেনি - এটি একটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেছে, যেখানে নারীরা নিজেদের কণ্ঠস্বর ফিরে পাচ্ছেন এবং কমিউনিটির ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় সমান অংশীদার হয়ে উঠছেন।

মোসা: লাকী আজার
প্রকল্প সমন্বয়কারী, নাগরিক উদ্যোগ
lakiakter4477@gmail.com



শান্তি ও ন্যায্যভিত্তিক উন্নয়নে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা (CS) ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CT) একীভূতকরণ (Mainstreaming): নীতি, কাঠামো ও কার্যক্রমে প্রয়োগ

মো: আবু নাহের (মাসুদ)

ভূমিকা:

বিশ্বে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। দ্বন্দ্ব সবসময় নেতিবাচক নয়; বরং সঠিকভাবে চিহ্নিত ও পরিচালনা করা গেলে এটি ইতিবাচক পরিবর্তন, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গঠনের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ডিজিটাল সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

একইসঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ, মূল্যস্ফীতি, জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক বৈষম্য এবং সুশাসন নিশ্চিত করার মতো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসব বিষয় উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী শান্তি পরিস্থিতি বর্তমানে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানবিক সংকট, বৈষম্য, সম্পদের প্রতিযোগিতা এবং দুর্বল শাসন

ব্যবস্থা দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। এসব সংঘাত বৈশ্বিক অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি সরবরাহ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলছে।

এই প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা, ন্যায্যবিচার, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্বন্দ্ব রূপান্তরের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু অবকাঠামোগত অগ্রগতির দিকে নয়, বরং সামাজিক সম্প্রীতি, সমতা, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর

দ্বন্দ্বকে শুধুমাত্র সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে ইতিবাচক পরিবর্তন ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পর্ক তৈরির সুযোগ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে “প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা” (Organizational Conflict Sensitivity) এবং “দ্বন্দ্ব রূপান্তর” (Conflict Transformation) ধারণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা বলতে বোঝায়- কোনো প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিদ্যমান দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, সামাজিক বৈষম্য এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যাতে তার উদ্যোগ অনিচ্ছাকৃতভাবে দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র না করে; বরং শান্তি, সম্প্রীতি, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সংহতি শক্তিশালী করে।

অন্যদিকে, দ্বন্দ্ব রূপান্তর হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের দৃশ্যমান বিষয়গুলোর পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত কারণ, সম্পর্কের সংকট এবং কাঠামোগত বৈষম্য চিহ্নিত করে ইতিবাচক ও টেকসই পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান যখন দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তরের নীতি অনুসরণ করে, তখন তা শুধু বিরোধ কমাতে সহায়তা করে না; বরং জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনগুলোর জন্য এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ও প্রয়োজনীয়।

সূত্রাং, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের দাবি।



দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা (Conflict Sensitivity) কি?

দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে, চলাকালীন এবং পরে স্থানীয় দ্বন্দ্ব পরিস্থিতির কারণ ও সম্ভাব্য প্রভাবগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো- কার্যক্রমের মাধ্যমে যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এবং বিদ্যমান শান্তি ও ইতিবাচক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়।

দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতার মূল বিষয়সমূহ:

প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ধারণা তৈরি করা

কর্মএলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের কারণ, মূল পক্ষ/অভিনেতা (Actors), দ্বন্দ্বের চালক (Drivers) এবং এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করা।

কার্যক্রমের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করা

প্রকল্প বা কার্যক্রম দ্বন্দ্বের কারণ, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, সম্পর্ক ও পরিস্থিতির ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্লেষণ করা। এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে যে, কার্যক্রমের ফলে কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক, প্রত্যাশিত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটতে পারে কিনা।

ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি ও নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা

কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা, যাতে দ্বন্দ্বের ঝুঁকি কমে, ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো যায় এবং শান্তি, সহযোগিতা, পারস্পরিক আস্থা ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়।

দ্বন্দ্ব রূপান্তর (Conflict Transformation)

দ্বন্দ্ব রূপান্তর হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো ঝগড়া বা বিরোধ শুধু থামিয়ে দেওয়া হয় না; বরং সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পর্ক ও পরিস্থিতির উন্নয়ন করা হয়।

দ্বন্দ্ব রূপান্তরের মাধ্যমে-

- দ্বন্দ্ব রূপান্তরের মূল কারণ (যেমন: বৈষম্য, অন্যায়, অধিকার বঞ্চনা, দুর্বল ব্যবস্থাপনা) চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়;
- সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির পরিবর্তে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়;
- সমাজের বিদ্যমান সমস্যা, ক্ষমতার ভারসাম্য ও সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়;

- দীর্ঘমেয়াদে শান্তি, ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা হয়;
- নারী, পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার মানুষসহ সমাজের সকল পক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়;
- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শুধু দ্বন্দ্বের সমাধান নয়; বরং দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণ দূর করে টেকসই পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা।

দ্বন্দ্ব মেইনস্ট্রিমিং (Mainstreaming)

মেইনস্ট্রিমিং (Mainstreaming) বা মূলপ্রোতে নিয়ে আসা হলো এমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন কোনো ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপদ্ধতি বা উপকরণকে গ্রহণ করে তা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান মূল্যবোধ, নীতিমালা, কৌশল, কাঠামো ও কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে একীভূত করে। এর মাধ্যমে নতুন ধারণাটি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার একটি স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও কার্যকারিতা বজায় রেখে নতুন জ্ঞান ও পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধারণ ও বিকশিত করতে সক্ষম হয়।

প্রকল্পে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং (Conflict Analysis Mainstreaming) প্রক্রিয়া:

কোনো প্রকল্পে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং বলতে বোঝায়- প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ঝুঁকি, কারণ ও প্রভাব নিয়মিতভাবে বিবেচনা করা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো "Do No Harm" নীতি অনুসরণ করে প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি, সহনশীলতা ও ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করা।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং-এর ধাপসমূহ:

১. প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ (Context Analysis)

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এ পর্যায়ে-

- এলাকার বিদ্যমান দ্বন্দ্বের কারণ, ধরণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা;
- দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, ক্ষমতা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা;

- দ্বন্দ্বের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে নতুন কোনো দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা যাচাই করা।

২. অংশীজন বিশ্লেষণ (Stakeholder Analysis)

দ্বন্দ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল পক্ষের-

- স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রত্যাশা ও উদ্বেগ;
- ক্ষমতার অবস্থান;
- পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করে প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেকে উপেক্ষিত বা বঞ্চিত মনে না করে।

৩. প্রকল্প পরিকল্পনায় দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্তকরণ

- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রকল্পের ঝুঁকি নিবন্ধন (Risk Register)-এ সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।



- **দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল সূচক (Conflict Sensitive Indicators) তৈরি:**
এমন সূচক নির্ধারণ করতে হবে যার মাধ্যমে বোঝা যাবে প্রকল্প কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব বা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে কিনা।

- **বাজেট ও সময় বরাদ্দ:** দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ, অংশীজন সংলাপ, মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং সংঘাত সংবেদনশীল কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও বাজেট প্রকল্প পরিকল্পনায় রাখতে হবে।

৪. দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল বাস্তবায়ন (Conflict Sensitive Implementation)

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়-

- স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে প্রকল্প কৌশলে পরিবর্তনের সুযোগ রাখতে হবে;
- প্রকল্প প্রস্তাবনা (FD-6) প্রণয়নের সময় সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত, স্বচ্ছ ও কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে;
- গুজব, ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস কমাতে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
- কর্মী নিয়োগ ও উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাত, বৈষম্য বা স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এড়িয়ে চলতে হবে।

৫. মনিটরিং ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation)

প্রকল্প চলাকালীন নিয়মিতভাবে দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- নির্ধারিত সময় পর পর দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি হালনাগাদ/ আপডেট করা;
- প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য উত্তেজনা চিহ্নিত করা;

- অভিযোগ, মতামত ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণের জন্য কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থাপনা -Feedback Mechanism চালু রাখা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সংশোধনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. প্রকল্প কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building)

প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের-

- দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা;
- দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ;
- Do No Harm নীতি;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি- এসব বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

মূল কথা হলো, প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে “আমরা কী করছি এবং এর ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, দ্বন্দ্বের সাথে সম্পৃক্ত এন্টরদের সম্পর্ক ও পরিবেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে এই বিষয়টি নিয়মিত বিশ্লেষণ করাই হলো দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মূলধারায় একীভূতকরণ বা মেইনস্ট্রিমিং।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ-

১. কর্মীদের অগ্রাধিকার ও সময়ের সীমাবদ্ধতা:

প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরও দৈনন্দিন কাজের চাপের কারণে অনেক সময় কর্মীরা দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণকে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন।

৬. তথ্যের প্রাপ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব:

দ্বন্দ্বপ্রবণ এলাকায় সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া কঠিন হতে পারে। অনেক সময় মানুষ নিরাপত্তার কারণে তথ্য দিতে অনিচ্ছুক থাকেন অথবা পক্ষপাতমূলক তথ্য প্রদান করেন।

৭. অতিরিক্ত জটিল বিশ্লেষণ:

অনেক সময় দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ অতিরিক্ত তাত্ত্বিক

বা জটিল হয়ে যায়, ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৮. সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা: কার্যকর দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের জন্য দক্ষ জনবল, পর্যাপ্ত অর্থ ও সময় প্রয়োজন। দ্রুত ফলাফল দেখানোর চাপের কারণে অনেক প্রকল্পে এটি যথাযথ গুরুত্ব পায় না।

৯. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মানসিকতার ঘাটতি: কিছু প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণকে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের কাজ হিসেবে দেখা হয়, ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সম্পৃক্ততা কম থাকে।

১০. সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বাধা: স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ভাষার প্রতি যথাযথ সংবেদনশীলতা না থাকলে দ্বন্দ্বের গভীর কারণ বোঝা কঠিন হয়।

১১. নিরাপত্তা ঝুঁকি: সংঘাতপূর্ণ এলাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কর্মী বা তথ্যদাতাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

১২. রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা: কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতাসালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণকে নেতিবাচকভাবে নিতে পারে।

১৩. লিঙ্গ ও অর্ন্তভুক্তির ঘাটতি: নারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে অর্ন্তভুক্ত না হলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং-এ

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশলসমূহ

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিং হলো এমন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রকল্পকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্ন্তভুক্তিমূলক এবং শান্তি সহায়ক করা যায়। দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ মেইনস্ট্রিমিংয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করা যায়-

১. বিশ্লেষণ সহজ ও ব্যবহারযোগ্য করা: বড় প্রতিবেদনের পরিবর্তে সহজ, বোধগম্য চেকলিস্ট, টুলস ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা।

২. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ:

স্থানীয় জনগণ, CBO, CSO ও অন্যান্য অংশীজনকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

৩. নিয়মিত বিশ্লেষণ করা:

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণকে এককালীন কাজ হিসেবে না দেখে প্রতি ৩/৬ মাস অন্তর হালনাগাদ করা।

৪. কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন:

প্রকল্পের শুরুতেই সকল পর্যায়ের কর্মীদের CSCT ও Do No Harm বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

৫. কার্যকর অভিযোগ ব্যবস্থা চালু করা:

নিরাপদ ও গোপনীয় অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যাতে করে কর্মী ও স্থানীয় জনগণ নির্ভয়ে তার সমস্যা/উদ্বেগের কথা জানাতে পারে।

৬. লিঙ্গ ও সামাজিক অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করা:

নারী, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতামত অর্ন্তভুক্ত করা; যাতে দ্বন্দ্বের মূল চিত্র পাওয়া যায়।

৭. নমনীয় পরিকল্পনা ও বাজেট রাখা:

প্রকল্পের বাজেট ও সময়সীমায় নমনীয়তা রাখা, যাতে নতুন ঝুঁকি দেখা দিলে প্রকল্পের কাজ ও কৌশলে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে।

৮. তথ্য যাচাই ও বহুমুখী উৎস ব্যবহার:

কটি নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর না করে একাধিক উৎস বিশেষ করে সরকারি তথ্য, স্থানীয় জনগণ, গণমাধ্যম, এনজিও ও মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সঠিকভাবে যাচাই করা।

সংগঠন/প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব

সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর

(CSCT) ধারণা কাজের ক্ষেত্রে

একীভূতকরণ (Mainstreaming):

Minds- উপলব্ধি ও জ্ঞানগত গ্রহণ-

দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CSCT)-কে সংগঠনের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও কর্মসংস্কৃতির অংশ হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও অভিন্ন বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন-

১. CSCT বিষয়ে ধারণাপত্র (Concept Note) তৈরি:

সংগঠনের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তরের মৌলিক ধারণা, প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল তুলে ধরে একটি সহজবোধ্য ধারণাপত্র তৈরি করতে হবে।

২. সকল পর্যায়ের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

CSCT-এর মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। এতে সংগঠনের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সকল কর্মী, সাধারণ পরিষদ (GB), নির্বাহী পরিষদ (EC) সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে একই ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়।

৩. নতুন কর্মীদের জন্য CSCT পরিচিতি নিশ্চিত করা:

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকরিতে যোগদানের সময় প্রাথমিক পরিচিতিমূলক সেশনের মাধ্যমে CSCT-এর ধারণা, নীতি ও কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৪. বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় CSCT

অর্ন্তভুক্ত করা:

সংগঠনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম ও রিফ্রেশার্স সেশনগুলোতে CSCT বিষয় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে, যাতে কর্মীরা নিয়মিতভাবে ধারণাটি অনুশীলন ও প্রয়োগের সুযোগ পান।

৫. সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রকাশনা, নিউজলেটার, বার্তাভিত্তিক উপকরণ এবং IEC (Information, Education and Communication) সামগ্রীর মাধ্যমে CSCT-এর গুরুত্ব ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

৬. অভ্যন্তরীণ শেখার পরিবেশ তৈরি:

সহকর্মীদের অংশগ্রহণে দলগত আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, শেখার সেশন ও প্রতিফলনমূলক (reflection) আলোচনা আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং CSCT প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. সেমিনার ও সংলাপ আয়োজন:

CSCT বিষয়ে গভীর ধারণা ও বিশ্লেষণী সক্ষমতা তৈরির জন্য নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা ও সংলাপের আয়োজন করতে হবে। এতে স্থানীয় প্রেক্ষাপট, দ্বন্দ্বের কারণ, ঝুঁকি এবং রূপান্তরের সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

৮. সহজবোধ্য ভাষায় তথ্য উপস্থাপন:

CSCT সম্পর্কিত সকল লিখিত উপকরণ, নীতিমালা, নির্দেশিকা, নিউজলেটার ও অন্যান্য প্রকাশনায় সহজ, স্পষ্ট ও ব্যবহারবান্ধব ভাষা ব্যবহার করতে হবে, যাতে সকল পর্যায়ের মানুষ সহজে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারেন।

Systems কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব

সংবেদনশীলতা ও প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব

রূপান্তর (CSCT) একীভূতকরণ:

দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CSCT)-কে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংগঠনের বিদ্যমান নীতিমালা, পদ্ধতি ও কাঠামোগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ করতে হবে, যাতে সকল কার্যক্রম দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

- সংগঠনের মানবসম্পদ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা (Safeguarding), জেন্ডার, PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য নীতিমালায় CSCT-এর মূল ধারণাগুলোকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি CSCT বাস্তবায়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP), চেকলিস্ট ও নির্দেশিকা তৈরি করতে

হবে, যাতে কর্মীরা দৈনন্দিন কাজে সহজে তা অনুসরণ করতে পারেন।

- কর্মীদের আচরণবিধি (Code of Conduct), কর্মপরিধি বা দায়িত্ব বিবরণী (Job Description) এবং কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও রূপান্তরমূলক আচরণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে কর্মীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংঘাতের ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি এবং সহনশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- সংগঠনের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Project Implementation Plan - PIP)-এর সঙ্গে CSCT-কে সমন্বিত করতে হবে, যাতে প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে দ্বন্দ্বের প্রভাব বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।
- প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংগঠনের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (SMT) থেকে একজন CSCT ফোকাল পার্সন মনোনয়ন দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি সংগঠনে একটি CSCT কোর টিম/খিৎক ট্যাংক/কোর কমিটি গঠন করতে হবে, যারা CSCT সংক্রান্ত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও শেখার বিষয়গুলো সমন্বয় করবে।
- সংগঠনে নিয়মিত সভাসমূহ বিশেষ করে নির্বাহী কমিটি (EC), সাধারণ পরিষদ (GB) এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (SMT) সভায় CSCT-কে নিয়মিত আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সভায় স্থানীয় দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি, দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল কর্মপদ্ধতি এবং দ্বন্দ্ব রূপান্তরের উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
- এছাড়া সংগঠনের অংশীদার প্রতিষ্ঠান, CBO, CSO এবং স্থানীয়

নেটওয়ার্কসমূহের মধ্যে CSCT ধারণা বিস্তারের জন্য একটি রিসোর্স ট্রান্সফার গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

- সর্বোপরি, CSCT-কে কোনো পৃথক কার্যক্রম হিসেবে নয়; বরং সংগঠনের নীতি, কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Actions - দৈনন্দিন কাজে

বাস্তব প্রয়োগ:

দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CSCT) কার্যক্রম বাস্তবায়নে করণীয়:

- দৈনন্দিন কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য কারণ, প্রভাব ও গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে দ্বন্দ্ব রূপান্তর এবং দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট টুলস, চেকলিস্ট ও মাঠ পরিচালনা নির্দেশিকা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে কার্যক্রমগুলো স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কোন অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করে।
- সংস্থার সকল পর্যায়ে দৈনন্দিন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কনফ্লিক্ট লেন্স (Conflict Lens) একটি বিশ্লেষণী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে কর্মসূচির সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব, ঝুঁকি, সুযোগ এবং বিভিন্ন পক্ষের ওপর এর প্রভাব চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।
- প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা বিবেচনায়

নিয়ে মানসম্পন্ন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও লক্ষ্যভুক্ত জনগণকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে তাদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CSCT) কার্যক্রমে কমিউনিটিভিক (CBO), নাগরিক সমাজ সংগঠন (CSO), যুব দল, স্থানীয় সমাজনেতা এবং সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কসমূহকে অংশীদার হিসেবে যুক্ত করতে হবে।
 - কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়মিত প্রতিবেদন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে হবে। এর পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা, সফল উদ্যোগ ও কেস স্টাডি সংরক্ষণ করলে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা আরও কার্যকর হবে।
 - বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংবেদনশীলতা ও দ্বন্দ্ব রূপান্তর (CSCT)-এর বাস্তব অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও শেখার বিষয়গুলো আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং কার্যক্রমের মান উন্নয়ন হবে।
- সর্বোপরি, CSCT কার্যক্রমের ধারাবাহিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বকে দৃশ্যমানভাবে এর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে, নিজে অনুসরণ করতে হবে এবং কর্মীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, উৎসাহ ও কোচিং প্রদান করতে হবে। নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মো: আবু নাছের (মাসুদ)

উর্ধ্বতন কর্মসূচি কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ
anasher75@yahoo.com



এলডিসি গ্রাজুয়েশন ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার

মোহন রবিদাস

সারসংক্ষেপ: জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) ২ জুন ২০২৬ বাংলাদেশের প্রস্তুতিকাল আরও তিন বছর বাড়ানোর সুপারিশ করেছে, যার ফলে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর নতুন উত্তরণ-তারিখ নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই 'মর্যাদার উত্তরণ' যদি মানবাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়, তাহলে পোশাক-শ্রমিক নারী, ক্ষুদ্র কৃষক, আদিবাসী, দলিত, চা-শ্রমিক, উপকূলীয় ও দরিদ্র-রোগী জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বেন। এই প্রবন্ধ মানবাধিকার কাঠামোয় সেই ক্ষতির রূপরেখা, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও নীতি-সুপারিশ তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) মর্যাদা থেকে উত্তরণ নিঃসন্দেহে জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক অর্জন। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের 'স্বল্পোন্নত দেশের' তালিকায় থাকা বাংলাদেশ আজ সেই তালিকা থেকে বেরিয়ে 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দ্বারপ্রান্তে। এই পথপরিক্রমায় মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক-পরিবেশগত ভঙ্গুরতা

সূচকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে - এটি অনস্বীকার্য। কিন্তু অর্জনের এই উৎসবের মাঝেও একটি কঠিন প্রশ্ন সমান জোরে মাথা তুলছে: এই 'উন্নয়ন'-এর সুফল কি সত্যিই সকলের কাছে পৌঁছাবে? নাকি উত্তরণের ফলে যে বাণিজ্য-সুবিধা হারাবে, যে শুল্কভার বাড়বে, যে সামাজিক সুরক্ষা সংকুচিত হবে-সেটির ভার বহন করবেন দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও

প্রান্তিক মানুষেরা? মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মূলনীতি হলো 'Leave No One Behind' -কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে। এলডিসি উত্তরণ যদি এই নীতি লঙ্ঘন করে এগিয়ে যায়, তাহলে সেটি কোনো প্রকৃত উন্নয়ন নয়, বরং বৈষম্যের নতুন রূপান্তর।

মানবাধিকার কাঠামো ও এলডিসি উত্তরণ: মূলনীতি

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত কয়েকটি মূলনীতি এলডিসি উত্তরণ আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক:

প্রথমত, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICESCR) অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো অধিকারসমূহের ‘ক্রমান্বয়ে পূর্ণ বাস্তবায়ন’ (progressive realization) নিশ্চিত করা কোনো পরিস্থিতিতেই ইচ্ছাকৃতভাবে পিছু হটা (retrogression) গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) অনুযায়ী অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন নারীর অধিকারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা তা আগেভাগে মূল্যায়ন করা রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা।

তৃতীয়ত, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র (UNDRIP) আদিবাসীদের ভূমি, সম্পদ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অধিকার রক্ষায় ‘মুক্ত, পূর্ব ও জ্ঞাত সম্মতি’ (Free, Prior and Informed Consent) নিশ্চিত করতে বলে।

চতুর্থত, ILO কনভেনশন ১১১ (বৈষম্যমুক্ত কর্মসংস্থান) ও ILO কনভেনশন ১৮৭ (নিরাপদ কাজের পরিবেশ) শ্রম অধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

পঞ্চমত, স্বাস্থ্যের অধিকার (ICESCR, ধারা ১২) অনুযায়ী সকল মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধের সুযোগ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এলডিসি উত্তরণের ফলে যদি এই অধিকারগুলো সংকুচিত হয়, তাহলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে- সেটিই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের বিষয়।

পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিক: কর্মসংস্থান ও মর্যাদার সংকট

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি খাত দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায়

৮৪ শতাংশ এবং জিডিপি প্রায় ১১-১২ শতাংশ জোগান দেয়। বিজিএমইএ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, এই খাতে প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০-৮৫ শতাংশই নারী। এঁরা মূলত দরিদ্র, গ্রামীণ, স্বল্পশিক্ষিত পরিবার থেকে আসা - যাঁদের কাছে এই কাজটিই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার একমাত্র পথ।

এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘এভরিথিং বাট আর্মস’ (EBA) এবং ‘জেনারাইজড স্কিম অব প্রেফারেন্সেস’ (GSP) সুবিধার আওতায় বাংলাদেশি পোশাকের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ধাপে ধাপে কমে আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৪৮ শতাংশ ইইউতে যায় এবং এর ৯৩ শতাংশই শুল্কমুক্ত। গ্রাজুয়েশনের তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড শেষে সাধারণ শুল্কহার (Most Favoured Nation, MFN) প্রযোজ্য হলে তৈরি পোশাকে গড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক বসবে, যা প্রতিযোগী দেশগুলোর (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মিয়ানমার) তুলনায় বাংলাদেশি পণ্যকে দামে অসুবিধায় ফেলবে।

সূত্র: BGMEA, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), Asian Development Bank (ADB) ২০২৪, UN DESA ২০২৫।

CEDAW-এর ধারা ১১ অনুযায়ী নারীর কর্মসংস্থানের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা। বাণিজ্য নীতি পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ নারীর চাকরি বিপন্ন হলে

এটি শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। কাজ হারানো নারী শ্রমিক পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ও পুনর্দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়েন- যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে একটি ‘সংযুক্ত লঙ্ঘন’ (intersecting violation) হিসেবে স্বীকৃত। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক ক্রয়াদেশ করার সময় বাংলাদেশে মাত্র চার মাসে প্রায় তিন লক্ষ পোশাক-শ্রমিক কাজ হারান, যাদের ৮২ শতাংশ নারী ছিলেন (বিবিএস ও অক্সফাম বাংলাদেশ, ২০২৩)। গ্রাজুয়েশনের পর শুল্কভার যদি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়, এই ধরনের ছাঁটাই হবে আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী।

ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ: খাদ্য অধিকার ও জীবিকার সংকট

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৮-৪০ শতাংশ এখনো কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। কিন্তু কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে এবং ক্ষুদ্র কৃষকরা (যাদের ২ বিঘার কম জমি) ইতিমধ্যেই উৎপাদন খরচ ও বাজারমূল্যের মাঝে চাপে পড়ছেন।

ডব্লিউটিও নিয়ম ও ভর্তুকি বিধিনিষেধ

এলডিসি সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ বর্তমানে কৃষি ভর্তুকি, রপ্তানি প্রণোদনা ও বিশেষ এবং ভিন্নতর আচরণের (Special and Differential Treatment, S&DT) সুবিধা পায়, যা ডব্লিউটিওর কৃষি চুক্তির অধীনে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য শিথিল করা হয়েছে। গ্রাজুয়েশনের পর এই

পরিসংখ্যান: সম্ভাব্য রপ্তানি ক্ষতি

সূচক	বর্তমান তথ্য	এলডিসি-উত্তর পরিস্থিতি
মোট পোশাক রপ্তানি (২০২৪-২৫)	৩৮-৪০ বিলিয়ন USD	ঝুঁকিতে ৫-৮ বিলিয়ন USD
ইইউতে শুল্কহার (বর্তমান)	০% (EBA সুবিধায়)	গড়ে ১১.৯% (MFN)
কানাডায় শুল্কহার (বর্তমান)	০% (LDC সুবিধা)	গড়ে ১৭-১৮% (পোশাকে)
মোট পোশাক শ্রমিক	প্রায় ৩৫ লক্ষ	৫-৭ লক্ষ ছাঁটাইয়ের ঝুঁকি
নারী শ্রমিকের অনুপাত	৮০-৮৫%	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

শিথিলতা উঠে যাবে। ফলে:

ক) সার, বীজ ও সেচ খাতে সরাসরি ভর্তুকি কমানোর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে।

খ) কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান প্রণোদনা ডব্লিউটিওর ‘নিষিদ্ধ ভর্তুকি’ বলে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।

গ) আমদানিকৃত সস্তা কৃষিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র কৃষক আরও কোণঠাসা হবেন।

নীতি কখনো ক্ষুদ্র কৃষকের খাদ্যোৎপাদন সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। কৃষি ভর্তুকি কমলে উৎপাদন খরচ বাড়বে, আয় কমবে এবং এক সময় জমি বিক্রি করে ভূমিহীন হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। এটি খাদ্যের অধিকার, জীবিকার অধিকার ও পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারের (UDHR, ধারা ২৫) সরাসরি লঙ্ঘন।

বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস, যাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০-২৫ লক্ষ। পাহাড়ি অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো এবং সমতলের সাঁওতাল, গারো, মণিপুরী, রাজবংশীসহ বিভিন্ন সম্প্রদায় মূলত বনজ সম্পদ, জুমচাষ ও ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

বিনিয়োগ আগ্রাসন ও ভূমির ঝুঁকি

এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণের জন্য সরকারের উপর চাপ বাড়বে। শিল্প পার্ক, পর্যটন প্রকল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি দখলের যে প্রবণতা ইতিমধ্যে দেখা গেছে, তা আরও তীব্র হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে হাজার হাজার পরিবার ভূমিচ্যুত হয়েছে -নতুন বিনিয়োগের চাপে এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী পেশা ও কুটির শিল্পের ক্ষতি

মুক্তবাণিজ্য চুক্তির ফলে আমদানিকৃত সস্তা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় আদিবাসীদের হাতে তৈরি বস্ত্র, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্পের বাজার বিপন্ন হবে। ফেয়ার ট্রেড সুবিধাসহ আদিবাসী পণ্যের বিশেষ সুরক্ষা এলডিসি

পরিসংখ্যান টেবিল

সূচক	তথ্য/পরিসংখ্যান	উৎস
কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যা	প্রায় ৬ কোটি	বিবিএস ২০২৪
ক্ষুদ্র কৃষক (২ বিঘার কম জমি)	মোট কৃষকের ৬৮%	কৃষি মন্ত্রণালয় ২০২৩
গড় বার্ষিক কৃষি আয়	৬৫,০০০-৮০,০০০ টাকা	বিবিএস ২০২৩-২৪
ভর্তুকি-প্রাপ্ত কৃষক পরিবার	প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ	কৃষি মন্ত্রণালয় ২০২৪
কৃষি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা (বার্ষিক)	প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা	অর্থ মন্ত্রণালয় ২০২৩-২৪

ICESCR-এর ধারা ১১ এবং জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টার অন ফুড (UN Special Rapporteur on the Right to Food) বারবার জোর দিয়েছেন যে বাণিজ্য

আদিবাসী জনগোষ্ঠী: ভূমি, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের সংকট

বাংলাদেশে সরকারি হিসেবে ৫২টিরও





মর্যাদার সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত ছিল, তা-ও কমে আসবে।

UNDRIP-এর ধারা ২৬ অনুযায়ী আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভাবে মালিকানাধীন, দখলকৃত বা ব্যবহৃত ভূমি, অঞ্চল ও সম্পদের উপর অধিকার স্বীকৃত। ধারা ১০ অনুযায়ী আদিবাসীদের “মুক্ত, পূর্ব ও জ্ঞাত সম্মতি” ছাড়া জোরপূর্বক স্থানান্তর করা যাবে না। বাংলাদেশ এই ঘোষণাপত্রে সম্মতি দিলেও পার্বত্য ভূমি বিরোধের বাস্তবতা এখনো এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

দলিত ও চা-শ্রমিক সম্প্রদায়

এলডিসি গ্রাজুয়েশনের ফলে আন্তর্জাতিক বিশেষ সুবিধা ও অনুদান কমে যাওয়ায় সরকারের সামাজিক সুরক্ষার বাজেট সংকুচিত হতে পারে, যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রান্তিক দলিত ও চা-শ্রমিকদের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, চা-বাগান বা শহরের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ পুষ্টিহীনতা, নিম্নমানের আবাসন ও প্রান্তিকতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা আশা করে, উত্তরণের পর তা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রপ্তানি

ও বাণিজ্যের নতুন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কমপ্লায়েন্সের চাপ বাড়লেও, দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা চা-শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি ও জীবনমান উন্নয়নে মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্র বাড়তি বিনিয়োগে অনীহা দেখাতে পারে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুমুক্ত সুবিধা হারানোর ধাক্কা যখন সামষ্টিক অর্থনীতিতে লাগবে, তখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষাবৃত্তি ও খাদ্য নিরাপত্তার মতো অতি-প্রয়োজনীয় সাহায্যগুলো আরও সীমিত হয়ে পড়বে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে আরও স্থায়ী রূপ দেবে।

এলডিসি মর্যাদার সুবাদে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও দাতা দেশের কাছ থেকে সামাজিক সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবাধিকার খাতে রেয়াতমূলক শর্তে ঋণ ও অনুদান পায়। গ্রাজুয়েশনের পর এই সহায়তা কমে আসবে, অনুদানের পরিবর্তে উচ্চসুদে বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণের চাপ বাড়বে। এর প্রভাব সরাসরি পড়বে দলিত ও চা-শ্রমিকদের জন্য পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমে।

ILO কনভেনশন ১১১ অনুযায়ী জাতি,

বর্ণ ও সামাজিক উৎস-ভিত্তিক বৈষম্য ছাড়া কর্মসংস্থানের অধিকার সংরক্ষিত। কিন্তু দলিত ও চা-শ্রমিকরা সমাজে বহু স্তরের বৈষম্যের শিকার। এলডিসি-পরবর্তী সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় সংকুচিত হলে এই সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা আরও প্রান্তিক হবেন। CESC-এর সাধারণ মন্তব্য ২০ স্পষ্ট করে যে ‘অন্যান্য মর্যাদা’ (other status) যেমন সামাজিক উৎস ও জন্মপরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য ICESCR-এর অধীনে নিষিদ্ধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দলিত ও চা-শ্রমিকদের প্রতি কাঠামোগত বৈষম্য এলডিসি উত্তরণে আরও গভীর হলে তা স্পষ্টত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন হবে।

উপকূলীয় ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী: জীবন ও বাসস্থানের অধিকার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলো - বিশেষত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা - জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাবের মুখে রয়েছে। সমুদ্রের লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমি ক্ষয়ের কারণে এই অঞ্চলের প্রায় ৩৫-৪০

লক্ষ মানুষ দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তায় জীবন কাটাচ্ছেন।

জলবায়ু তহবিলে প্রবেশাধিকার ত্রাস

এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো চুক্তির (UNFCCC) অধীনে বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা পায়: স্বল্পোন্নত দেশ তহবিল (LDCF), অভিযোজন তহবিল (Adaptation Fund) এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলে (GCF) সহজ প্রবেশাধিকার। গ্রাজুয়েশনের পর এই অগ্রাধিকার কমে আসবে; তহবিল প্রাপ্তি আরও প্রতিযোগিতামূলক ও শর্তসাপেক্ষ হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ২০২১ সালের প্রস্তাবনা (৪৮/১৩) স্বীকৃতি দিয়েছে যে পরিষ্কার, সুস্থ ও টেকসই পরিবেশ উপভোগ করা একটি মানবাধিকার। জলবায়ু ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় মানুষেরা যখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বঞ্চিত হন, তখন UDHR-এর ধারা ৩ (জীবনের অধিকার) এবং ধারা ২৫ (পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার) সরাসরি লঙ্ঘিত হয়।

২০২৩ সালের ঘূর্ণিঝড় মিথিলি ও ২০২৪ সালের ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর সাতক্ষীরা ও খুলনার হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েন। এই পরিবারগুলোর পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রাজুয়েশনের পর এই তহবিলে প্রবেশাধিকার কমলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আরও কঠিন হবে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক রোগী: স্বাস্থ্যের অধিকার ও ওষুধের ন্যায্য মূল্য

বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। স্থানীয় উৎপাদিত ওষুধ দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে এবং প্রায় ১৫০টি দেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু এলডিসি উত্তরণের পর মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত ট্রিপস চুক্তির ছাড় (TRIPS Waiver) আর পাওয়া যাবে না।

পরিসংখ্যান: সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি ও প্রভাব

ওষুধের ধরন	বর্তমান গড় মূল্য (বাংলাদেশ)	পেটেন্ট মূল্য (আন্তর্জাতিক)	ক্ষতিগ্রস্ত রোগী
ক্যান্সার কেমোথেরাপি (মাসিক)	৫,০০০-১৫,০০০ টাকা	৫০,০০০-৫ লক্ষ টাকা	প্রায় ১.৫ লক্ষ নতুন রোগী/বছর
এইচআইভি/এইডস ARV (মাসিক)	৪০০-৮০০ টাকা	৫,০০০-১৫,০০০ টাকা	প্রায় ১৪,০০০ রোগী
ডায়াবেটিস ইনসুলিন (মাসিক)	৩০০-৬০০ টাকা	২,০০০-৫,০০০ টাকা	প্রায় ১.৩ কোটি রোগী
হেপাটাইটিস সি চিকিৎসা (কোর্স)	৮,০০০-২০,০০০ টাকা	৩-৫ লক্ষ টাকা	প্রায় ৭০ লক্ষ আক্রান্ত

ট্রিপস ওয়েভার ও জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন

এলডিসিভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ড্রিউটিওর ট্রিপস চুক্তির অধীনে মেধাস্বত্ব (পেটেন্ট) ছাড়াই জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ - যেমন ক্যান্সারের কেমোথেরাপি, এইচআইভি/এইডসের অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল, ডায়াবেটিসের ইনসুলিন - বিদেশের তুলনায় অত্যন্ত কম দামে পাওয়া সম্ভব হয়। গ্রাজুয়েশনের পর এই ছাড় উঠে গেলে আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানির পেটেন্ট মেনে চলতে হবে, যা উৎপাদন খরচ ও পরিণামে ওষুধের বাজারমূল্য আশাতীত বৃদ্ধি করবে।

সূত্র: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০২৪, ড্রিউএইচও বাংলাদেশ প্রতিবেদন ২০২৪, MSF Access Campaign ২০২৫, UNCTAD ২০২৫।

ICESCR-এর ধারা ১২ অনুযায়ী 'সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্বাস্থ্যমান' (highest attainable standard of health) উপভোগ করার অধিকার সকলের। জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টারের অন হেলথ বারবার বলেছেন যে ট্রিপস চুক্তির কঠোর প্রয়োগ এবং পেটেন্টভিত্তিক মূল্যব্যবস্থা দরিদ্র দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের সক্ষমতা হারানো মানে কোটি কোটি দরিদ্র

রোগীর জীবন রক্ষাকারী ওষুধের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া - যা একটি স্পষ্ট মানবাধিকার সংকট। এলডিসি উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর একাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়; এটি একটি কাঠামোগত মানবাধিকার ঝুঁকি, যা আগেভাগে চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ না নিলে দীর্ঘমেয়াদি বৈষম্যকে আরও গভীর করবে।

নীতি-সুপারিশ: মানবাধিকারভিত্তিক (Human Rights Based) উত্তরণ কৌশলের রূপরেখা

সরকারের প্রতি সুপারিশ

ক) মানবাধিকার প্রভাব মূল্যায়ন (Human Rights Impact Assessment): এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী প্রতিটি বাণিজ্য নীতি পরিবর্তনের আগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিরেখা: জাতীয় বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ের একটি ন্যূনতম সীমা (জিডিপির কমপক্ষে ৩%) নির্ধারণ করতে হবে, যা এলডিসি-পরবর্তী আন্তর্জাতিক সহায়তা হ্রাসের ক্ষতিপূরণ করবে।



গ) ওষুধ শিল্পে বিশেষ সুরক্ষা: জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের সক্ষমতা রক্ষায় ডব্লিউটিওর সাথে কমপালসরি লাইসেন্সিং সুবিধা ব্যবহারের কৌশল এখনই তৈরি করতে হবে।

ঘ) আদিবাসী ভূমি অধিকার সুরক্ষা: নতুন বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরির সময় আদিবাসী ভূমি অধিকার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং UNDRIP মেনে মুক্ত, পূর্ব ও জ্ঞাত সম্মতি ছাড়া কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা যাবে না।

নাগরিক সমাজের প্রতি সুপারিশ

- » দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো এলডিসি উত্তরণ পর্যবেক্ষণে একটি 'সামাজিক পর্যবেক্ষণ সূচক' তৈরি করতে পারে, যা প্রতি বছর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিস্থিতি নিরীক্ষা করবে।
- » জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (UPR) ও অন্যান্য মানবাধিকার প্রক্রিয়ায় এলডিসি উত্তরণের মানবাধিকার প্রভাব তুলে ধরতে হবে।

» দলিত ও চা-শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি কাজ করে তাদের অভিজ্ঞতা ও উদ্বোধন নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ জোরদার করতে হবে।

দাতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি সুপারিশ

- » বাংলাদেশের গ্রাজুয়েশন সময়কালে উন্নত দেশগুলোর উচিত শুধু শুষ্ক সুবিধা নয়, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরেও সহায়তা অব্যাহত রাখা।
- » জলবায়ু তহবিলে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েটিং দেশগুলোর জন্য অন্তত পাঁচ বছরের 'জলবায়ু গ্রেস পিরিয়ড' বিবেচনা করা উচিত।

শেষ কথা:

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী - উন্নয়নের সিঁড়ি সবসময় সবার জন্য সমান হয় না। পোশাক-শ্রমিক নারী যিনি ভোরের আলোয় কারখানায় ছোটেন, চা-বাগানের শ্রমিক যিনি প্রজন্মের পর

প্রজন্ম একটুকু মজুরির জন্য কাজ করেন, পাহাড়ের আদিবাসী যিনি তার পূর্বপুরুষের ভূমি আঁকড়ে ধরেন, উপকূলের কৃষক যিনি প্রতি বছর বাড়ের মুখে দাঁড়িয়ে ফসল বোনে, দরিদ্র রোগী যিনি সন্তায় ওষুধ না পেলে বাঁচতে পারবেন না - এই মানুষেরা যদি উত্তরণের মূল্য শোধ করেন, তাহলে সেই উত্তরণ আসলে কার জন্য?

মানবাধিকারভিত্তিক উত্তরণ মানে হলো: যে সুবিধা হারাবে তার বিকল্প নিশ্চিত করা, যে মানুষ পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন তার জন্য সুরক্ষার দেয়াল তোলা, এবং উন্নয়নের প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর যুক্ত করা। বাড়তি তিন বছরের প্রস্তুতিকাল এই কাজের জন্যই ব্যবহার করতে হবে। আসলে টেকসই উত্তরণের মাপকাঠি হওয়া উচিত- সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবন কতটুকু ভালো হলো।

মোহন রবিদাস

অ্যাডভোকেসি অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ
rdmohon.nu@gmail.com



আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৬:

রেইনবো বাংলাদেশের পথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, জ্ঞান ও ন্যায্য অংশীদারিত্ব

শিপন কুমার রবিদাস

প্রতি বছরের ৯ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' আমাদের একটি মৌলিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। আর সেটি হলো-একটি রাষ্ট্রের শক্তি তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, ন্যায্যভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং সকল জনগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা নিশ্চিত করার সক্ষমতায়। আজকের বিশ্বে উন্নয়নের মানদণ্ড শুধু মাথাপিছু আয়, অবকাঠামো কিংবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে সীমাবদ্ধ নেই;

বরং একটি রাষ্ট্র কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক, কতটা বৈষম্যহীন এবং কতটা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান করে-তাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর প্রায় ৪৭৬ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানবসভ্যতার প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডারের ধারক-বাহক। অথচ তারাই আজও ভূমি হারায়, ভাষা হারায়, বৈষম্যের শিকার হয় এবং উন্নয়নের মূলধারা থেকে পিছিয়ে থাকে।

এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের

প্রতিপাদ্য "Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being"। এই প্রতিপাদ্য প্রথম দর্শনে মাতৃস্বাস্থ্যের বিষয় বলে মনে হলেও এর তাৎপর্য অনেক বিস্তৃত। এ বছরের প্রতিপাদ্য আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়-উন্নয়ন মানে কেবলমাত্র অবকাঠামো নয়; মানুষের জ্ঞান, লোকায়ত সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মানও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বের বহু অঞ্চলে আদিবাসী ধাত্রীরা শুধু শিশু জন্মানো

সহায়তা করেন না; তাঁরা মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি, ভেষজ চিকিৎসা, সামাজিক সংহতি এবং প্রজন্মান্তরে জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে মর্যাদা দেওয়া আজ টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। এই জ্ঞানকে অবজ্ঞা না করে আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যতের পথ।

বাংলাদেশও বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক একটি রাষ্ট্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, শ্রো, খিয়াং, লুসাইসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং সমতলের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মাহাতো, গারো, হাজং, কোচ, রাজবংশী, রাখাইনসহ বহু জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভূখণ্ডের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাঁদের কৃষিজ্ঞান, বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, লোকজ চিকিৎসা, ভাষা, সংগীত এবং জীবনদর্শন বাংলাদেশের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কোনো দয়া বা অনুগ্রহের বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব

এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল অঙ্গীকার ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। সেই অঙ্গীকার আজও আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরেও একটি কঠিন বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই দেশের আদিবাসী, দলিত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনো উন্নয়নের মূলধারায় সমানভাবে যুক্ত হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আমাদের সেই অসম বাস্তবতার দিকে নতুন করে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সংবিধান একটি সুস্পষ্ট নৈতিক ও আইনি ভিত্তি প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২৭ সকল নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমতার নিশ্চয়তা দেয়। অনুচ্ছেদ ২৮ ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেয়। অনুচ্ছেদ ২৯ সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠন

কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয় মাত্র নয়; এটি সাংবিধানিক দায়িত্বও।

এ কারণেই বৈষম্যবিরোধী একটি কার্যকর আইন প্রণয়নের আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, ভূমি, সামাজিক সেবা এবং বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যদি বৈষম্যের শিকার মানুষ সহজে প্রতিকার না পান, তাহলে সাংবিধানিক সমতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে অপর্যাপ্ত থেকে যায়। একটি আধুনিক বৈষম্যবিরোধী আইন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-উভয় পর্যায়ে জবাবদিহি বাড়াতো পারে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিও এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আস্থা পুনর্গঠন, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করা। বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয় স্পষ্ট যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়নের জন্য সংলাপ, আস্থা এবং অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। এই অভিজ্ঞতা দেশের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।





আন্তর্জাতিক পরিসরেও একই বার্তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। জাতিসংঘের Indigenous Peoples-এর অধিকার বিষয়ক ঘোষণা (UNDRIP) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তে অর্থবহ সম্পৃক্ততার নীতিকে গুরুত্ব দেয়। যদিও প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর আলোকে এসব নীতির প্রয়োগ করে, তবুও অংশগ্রহণ, মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের মতো মূল্যবোধ সর্বজনীন।

বর্তমান সরকারের ঘোষিত ‘রেইনবো’ অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রদর্শন বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে দেখার একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। একটি রংধনু যেমন বহু রঙের সমন্বয়ে পূর্ণতা পায়, তেমনি বাংলাদেশও তার সব জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই নীতির বাস্তব সফলতা নির্ভর করবে কতটা

কার্যকরভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, অংশগ্রহণ এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা যায় তার ওপর। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন নীতিনির্ধারণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হবে।

তবে বাস্তবতার চিত্র এখনো অনেক ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক নয়। ভূমি নিয়ে বিরোধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, কর্মসংস্থানের সংকট এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সীমিত অংশগ্রহণ-এসব সমস্যা বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন বাস্তবতা। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের আগে তাদের মতামত ও সম্মতি নিশ্চিত করার বিষয়টিও আরও প্রাতিষ্ঠানিক হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ডিজিটাল সেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এখন প্রয়োজন এই সেবাগুলোকে আরও সংস্কৃতিসংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। পাহাড়ি কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন আদিবাসী মা যেন নিজের ভাষায় স্বাস্থ্যসেবা পান, স্থানীয়

ধাত্রীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে তাদের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়-এগুলো সময়ের দাবি।

একইভাবে শিক্ষা খাতেও মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান নথিভুক্তকরণ এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সহায়তা রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ একটি ভাষা হারিয়ে গেলে শুধু শব্দ হারায় না; হারিয়ে যায় ইতিহাস, দর্শন এবং একটি জনগোষ্ঠীর পৃথিবীকে দেখার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বন, পাহাড়, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। টেকসই উন্নয়নের যে ধারণা আজ বিশ্ব গ্রহণ করছে, আদিবাসী সমাজ বহু শতাব্দী ধরে তার বাস্তব চর্চা করে আসছে। তাই জলবায়ু নীতি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো শুধু



ন্যায়সংগত নয়, বরং কার্যকরও।

রেইনবো বাংলাদেশের দর্শনকে বাস্তব রূপ দিতে হলে কয়েকটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। প্রথমত, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থবহ অংশগ্রহণ ও পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা এবং আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্যজ্ঞান ও স্থানীয় ধাত্রীদের দক্ষতাকে আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে। চতুর্থত, ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছ, মানবাধিকারসম্মত এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পঞ্চমত, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ষষ্ঠত, নারী, শিশু ও তরুণদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সপ্তমত, উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সরকার,

স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আস্থাভিত্তিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

বাংলাদেশ উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই যাত্রা তখনই অর্থবহ হবে, যখন উন্নয়নের সুফল দেশের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে পৌঁছাবে এবং কেউ পিছিয়ে থাকবে না। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আমাদের সেই প্রতিশ্রুতিই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়-বৈচিত্র্যকে সম্মান করা মানে জাতিকে শক্তিশালী করা; সংস্কৃতিকে রক্ষা করা মানে ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করা; আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করা মানে গণতন্ত্রকে গভীরতর করা।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস তাই কেবল আনুষ্ঠানিক উদযাপনের দিন নয়। এটি আত্মসমালোচনার দিন, অঙ্গীকারের দিন এবং নতুন সামাজিক চুক্তি গড়ে তোলার দিন। আমরা কি এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে পেরেছি, যেখানে একজন আদিবাসী নারী, একজন দলিত তরুণ, একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী বা একজন প্রান্তিক

শ্রমজীবী সমান মর্যাদায় নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ পান? আমাদের মনে রাখতে হবে, বৈচিত্র্য কোনো বিভাজন নয়; বৈচিত্র্যই বাংলাদেশের শক্তি। যে রাষ্ট্র তার ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করতে পারে, সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, মানবিক এবং টেকসই।

রেইনবো বাংলাদেশের প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন বৈচিত্র্যকে শুধু উদযাপন নয়, নীতিতে, আইনে, বাজেটে এবং প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত করা হবে। কারণ একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষও অনুভব করেন-এই রাষ্ট্র আমার, এই উন্নয়ন আমার, এই ভবিষ্যৎও আমার।

এই ৯ আগস্ট আমাদের অঙ্গীকার হোক- রেইনবো বাংলাদেশের প্রতিটি রঙ সমান মর্যাদায় বিকশিত করা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, সংস্কৃতি, নেতৃত্ব এবং অধিকারকে সম্মান জানিয়ে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যেখানে উন্নয়নের আলো সবার ঘরে সমানভাবে পৌঁছাবে, তখনই আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের চেতনা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে, আর বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিপন কুমার রবিদাস

সাধারণ সম্পাদক, বিডিইআরএম
shipon.robidas@gmail.com



নিজের গড়া ডব্লিউটিও নিজেই বদলাতে চায় আমেরিকা

মারুফ বরকত

যুক্তরাষ্ট্রই সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকর্তা। যুদ্ধ বা বাণিজ্য, সব জায়গায় তাদেরই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। সারা বিশ্বের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, বা আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, ক্রেতার অধিকার বা মানবাধিকারের তোয়াক্কা না করে করপোরেশনের মুনাফা নিশ্চিত করতেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আবির্ভাব হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। যদিও, বিগত কয়েক দশক ধরে উন্নয়নশীল

দেশগুলোর নানা আপত্তি, অনুরোধের ভিত্তিতে বেশ কিছু “গণতান্ত্রিক অগ্রগতি” হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটিতে। যার মধ্যে ছিল ঐকমত্য বা কনসেনসাস এবং বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মতো কিছু ইতিবাচক চর্চা। এগুলো দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য খুব একটা কাজে না আসলেও কারো মনখুশিমতো কোনো একক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ ছিল না এতোদিন। যেমন, কৃষি নিয়ে

অবাধ বাণিজ্য এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, কৃষি চুক্তিতে পাবলিক স্টকহোল্ডিং নিয়ে কোনো স্থায়ী সমাধানে আসার ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়ায়।

কিন্তু ক্যামেরুনের ইয়াউন্ডেতে চলমান চতুর্দশ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনটি বিগত ১৩টি সম্মেলন থেকে একেবারে আলাদা হতে যাচ্ছে। ডব্লিউটিওতে নিজেই নিজের নিয়ম ভেঙে রীতিমতো একটি ক্যু

করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সঙ্গে আছে তার সমর্থকেরা। উরুগুয়ে রাউন্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও তার নিয়মাবলি তৈরি করে নিজেদের প্রয়োজনমতো গ্যাট চুক্তিকে (GATT) “আধুনিক ও বিস্তৃত” রূপ দেওয়ার পর এবং বিশেষ করে কৃষি খাতের মতো সংবেদনশীল খাতে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে মূল নিয়মগুলোতে নিজেদের জন্য বিশেষ ছাড় নিশ্চিত করার পর তারা এখন এসে বলছে যে এটি আর কাজ করার উপযোগী নয়

উরুগুয়ে রাউন্ডের পর সময় অনেক গড়িয়েছে। ধীরে ধীরে অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ এতে যুক্ত হয়েছে। অনেকেই কিছু সুবিধার আশ্বাসে অনেক চড়া শর্তে এতে যোগ দিয়েছে। তবে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সুবিধা নিয়ে ব্যাপক উন্নতি করতে পেরেছে শুধুমাত্র চীন। বর্তমানে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান ইকোনমি চীনও যেমন “উন্নয়নশীল দেশ”, তেমনি দারিদ্রপীড়িত

অনেক আফ্রিকান দেশও সংজ্ঞায়নের চক্রে পড়ে একই মানের “উন্নয়নশীল দেশ”। তারা এই “গণতান্ত্রিক” কিন্তু একপেশে নিয়মের সংস্থার অধীনে এক মহা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে অভিযোগ করতে শুরু করেছে। এমনকি ডব্লিউটিও’র সুবিধা নিয়ে চীনের এই উন্নতি আমেরিকারও চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ডিসেম্বরে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের এবং পরের মাসে জানুয়ারিতে দেয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংস্কার প্রস্তাব, এবং তারও পরে গত সপ্তাহে আমেরিকার দেয়া আরো কিছু নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলছে তারা। প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাপী নাগরিকদের প্রবল প্রতিবাদের বিপরীতে গণবিমুখ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পরিচালিত বাণিজ্য ব্যবস্থাকে এতোদিন যারা সুরক্ষা দিতে মরিয়া হয়ে ছিল, তারা কেন হঠাৎ এমন পরিবর্তনের

জন্য উঠে পড়ে লাগলো? যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে বন্ধু হয়ে ছিল, তারাও নতুন ব্যবস্থার ব্যাপারে বেশ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্র রীতিমতো হুমকি দিয়েছে, তাদের প্রস্তাবমতো সংস্কার না হলে, অর্থাৎ, তারা যেভাবে চায় সেভাবে না পেলে এই সংস্থাটিকে অদূর ভবিষ্যতে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়া হবে। কারণ এটি নাকি বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং টেকসই নয়। নতুন ব্যবস্থায় তারা ঐকমত্য প্রথা (কনসেনসাস) বাতিল করতে চায়, তার বদলে পুরিল্যান্ডেরালস নামে এক অদ্ভুত যৌথ পদ্ধতি চালু করতে চায়, মোস্ট ফেভারড নেশনস সীমিত করতে চায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নতুন সংজ্ঞার ভেতরে ফেলে তাদের সুযোগ সুবিধা চাওয়ার জায়গা সীমাবদ্ধ করতে চায়, অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা তুলে দিতে চায় এবং সর্বোপরি, ডব্লিউটিওকে





নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। মানে, এতো একতরফা ব্যবস্থার মধ্যেও যেটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, তাও তারা নতুন সংস্কারের মাধ্যমে শেষ করে দিতে চায়।

এমন এক সময়ে এটা ঘটছে যখন যুদ্ধ এবং গণহত্যা, ক্রমবর্ধমান জলবায়ু বিপর্যয়, ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণ, জোরালো একতরফা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, বিপর্যস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। এর কোনোটিই কিন্তু সরাসরি মূল সংস্কার এজেন্ডায় আনা হয়নি। কিন্তু এগুলোই যে মূলত এই ক্ষমতার লড়াইকে পরিচালনা করছে, তা সহজেই বোধগম্য। তারা এতোদিন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কঠোর নিয়মাবলীতে হাঁসফাঁস করতে করতে প্রতিবাদ করতে থাকা এবং কিছু নিয়ম শিথিল করার ব্যাপারে কথা বলতে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে “ব্লকার” আখ্যা

দিয়ে আসছিল। কিন্তু কেউ বলছে না, প্রকৃত ব্লকার ছিল তারা। তারা দোহা রাউন্ডের উন্নয়ন প্রতিশ্রুতিগুলো বাধাগ্রস্ত করেছে, বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা রীতিমতো পঙ্গু করে দিয়েছে, বারবার তাদের রায় মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে, অস্বীকার করেছে, কোভিড মহামারীর সময় জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ওপর থেকে পেটেন্ট প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছে, দরিদ্র কৃষক ও খাদ্য সংকটে ভুগতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধা দিতে চাওয়া কৃষিতে পাবলিক স্টকহোল্ডিং প্রস্তাব প্রায় একযুগ ধরে আটকে রেখেছে। অথচ, আজ এসে তারা বলছে, ভুগতে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিবাদই নাকি বাণিজ্য ব্যবস্থার অন্তরায়।

নতুন প্রস্তাবে ঐকমত্য বা কনসেনসাস ব্যবস্থার বিপরীতে প্রস্তাব করা হয়েছে একটি বহুপাক্ষিক বা পুরিল্যান্ডেরাল

ব্যবস্থা। তাদের মতে, সব দেশ একমত (কনসেনসাস) না হলে কোনো একটা চুক্তি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু, বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা হলো, যারা চায় তারা একজোট হয়ে অন্যদের বাদ দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নতুন করে চালু হয়েছে ফ্যাসিলিটেশন পদ্ধতি। একজন ক্ষমতাবান ফ্যাসিলিটের মূল বিষয়টি উপস্থাপন করে দ্রুত সিদ্ধান্তে চলে আসবেন, যেখানে কথা বলার সুযোগ খুব কম থাকবে, ফলে শক্তিশালী দেশের সুবিধা অনুযায়ী নতুন কোনো সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে যাবে। ২০১৭ সালে বুয়েনোস আইরেসে অনুষ্ঠিত একাদশ মন্ত্রী সম্মেলনে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট ইনিশিয়েটিভসের (JSI) মাধ্যমে এই ব্যবস্থার সূচনা হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে রাজি অল্প কিছু দেশ মিলে একটা প্রস্তাবনা সামনে নিয়ে আসা, যা কনসেনসাস প্রথার সাথে সাংঘর্ষিক।

বুয়েনোস আইরেসে উদ্ভূত জয়েন্ট স্টেটমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ব্যবস্থার ফল হিসেবে নতুন প্রস্তাবে যা চুক্তিতে রূপ নিতে যাচ্ছে তা হলো,

(১) অভ্যন্তরীণ পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ, যা মূলত ডল্লিউটিওর আওতার বাইরে পেছন দরজা দিয়ে সম্পন্ন করা হবে,

(২) ই-কমার্স মোরাটিরিয়াম, যেহেতু মূল আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি, তাই পার্শ্বচুক্তি হিসেবে আত্মহী সদস্যদের নিয়ে চালু করা হবে, এবং

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে “অন্তর্বর্তীকালীন” হিসেবে, এনেক্স ৪ আকারে ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন চালু করা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কনসেনসাসের পক্ষেও থাকবে, আবার সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশনে যোগ দেবে।

নতুন এই প্রস্তাব যেসব সমস্যা তৈরি করবে তা হলো,

(১) এটি বহুপাক্ষিকতার ভিত্তিকে দুর্বল করবে, যা সকল রাষ্ট্রকে সমান হিসেবে বিবেচনা করত।

(২) এটি উরুগুয়ে রাউন্ডের সময় ডল্লিউটিওর মূল ভিত্তি হিসেবে উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মেনে নেয়া মূল ব্যবস্থাকে অস্বীকার করবে।

(৩) এটি গ্যাটের (GATT) অধীনে থাকা সেই বিভাজনকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে যা মারাকেশ চুক্তির মাধ্যমে শেষ করার লক্ষ্য ছিল। এটি ছোট এবং দরিদ্র দেশগুলোকে কেবল ‘নিয়ম পালনকারী’ স্তরে নামিয়ে দেবে, যা ডল্লিউটিওতে বিদ্যমান অসমতা আরও বাড়াবে।

(৪) এটি স্বনির্বাচিত গ্রুপগুলোকে এমন সব বিষয়ে নিয়ম তৈরির লাইসেন্স দেবে যা প্রকৃত বাণিজ্য চর্চার বিরুদ্ধে এবং এর সীমা অনির্দিষ্ট হতে পারে।

(৫) এটি শক্তিশালী নিয়ম-নির্ধারকদের তাদের পছন্দমতো বিষয় বেছে নিতে এবং তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিষয়গুলোকে

এড়িয়ে যেতে ক্ষমতা প্রদান করবে। এবং

(৬) এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরও বিভক্ত করবে। কারণ কিছু বড় উন্নয়নশীল দেশ এমন বহুপাক্ষিক চুক্তি থেকে সুবিধা পেতে পারে যা স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs), ছোট ও ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনীতি (SVEs) এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর (SIDS) জন্য ক্ষতিকর হবে।

ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডেতে চলমান চতুর্দশ মন্ত্রী সম্মেলনে অংশ নেয়া সদস্য দেশগুলো কী অবস্থান নেয় তার উপর নির্ভর করবে সামনের দিনের বাণিজ্যের ভবিষ্যত। যদিও আশার চেয়ে আশঙ্কার পাল্লাই ভারি।

মারুফ বরকত

গবেষক, নাগরিক উদ্যোগ

bmaruf@gmail.com

(ইয়াউন্ডে, ক্যামেরুন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চতুর্দশ মন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে)